উন্নয়ন গবেষণায় প্রত্যয়নঃ নৃবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে

ইসরাত আহমেদ *

উন্নয়ন ধারণার নানাদিক ঃ

বিশ্বে বহুল আলোচিত অন্যতম প্রত্যয় হচ্ছে উন্নয়ন বা Development. সামাজিক বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত বিভিন্ন ধারণা থেকে সমাজের প্রগতিশীল রূপান্তর হিসেবে উন্নয়ন প্রত্যয়টির ধারণার বিকাশ ঘটেছে। মূলতঃ উন্নয়ন ধারণার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের এবং উনবিংশ শতকের রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ এবং বিবর্তনবাদী সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিষদ অবদান রেখেছেন। উন্নয়ন প্রত্যয়টি পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটে বহু সময় ধরে জনগণের চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বর্তমান বিশ্বে এর ব্যাপকতা ও বিশালতা নিয়ে চিন্তাভাবনার নানাদিক উন্মোচিত হচ্ছে।

উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, একে অর্থনীতির আওতার মাঝেই অধিক আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। সে কারণেই উন্নয়ন অনেক সময় ধরে তত্ব ও চর্চার ক্ষেত্রে অর্থনীতির সীমানায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মডেল প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়নি। উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথাগত অর্থনৈতিক ও সামাজিক মডেল অনুসরণের ফলে বিশ্বের সকল স্থানে উন্নয়নের সুফল লাভ সম্ভব হয়নি। এর কারণ হিসেবে সনাক্ত করা যায়, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক গতিশীলতাকে অবহেলা ও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উপাদান বিষয়ক প্রথাগত মডেল অনুসরণের প্রবণতাকে।

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়ন ধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, উন্নয়নকে একসময় স্বর্গীয় একটি আরোপন হিসেবে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মের ফলাফল হিসেবে চিন্তা করা হতো। এ সূত্র অনুযায়ী মানুষকে ক্ষমতাহীন স্বত্তা বলে বিবেচনা করা হয়েছিল যাতে তাদেরকে ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতাসীন মনে করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ ধারণা বর্জন করে উন্নয়নকে এমন এক বিষয় হিসেবে মনে করা হয় যা মানব ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবিত হতে পারে।[১] অর্থাৎ মানুষকে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা থেকে সক্রিয় কর্মীতে রূপদান করা হয় যারা নিজেদের ভবিষ্যতকে নির্মাণ করতে পারে। এভাবে উন্নয়ন প্রত্যয়টি দিনে দিনে বিবর্তিত হয় এবং একই সাথে ইতিহাসে মানুষের ভূমিকা এবং স্থানও বটে। বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞানীগন উন্নয়নকে সনাক্ত করেন সচেতন ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা হিসেবে যার ফলশ্রুতিতে আর্থ–সামাজিক পরিবর্তন লাভ করা যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নয়নকে প্রায়শই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি উন্নয়নে অন্যান্য আরো প্রাসঙ্গিক উপাদানের বিবেচনার বিষয়টি আজকাল স্বীকৃত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি অংশ বা আয়তনের অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে, সামগ্রিকতাকে নয়। এক্ষেত্রে মেয়ারের উদ্ধৃতি দেয়া যায়,

> Usually it is focussed on the nation state as the unit of development, but national development, is a term which encompasses at a minimum social and political development, as well as economic development.[২]

অর্থাৎ, সাধারণভাবে জাতীয় রাষ্ট্রে উন্নয়নের একক হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করা হলেও জাতীয় উন্নয়ন এমন একটি বিষয় যা নূন্যতম পক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্তর্ভূক্ত করে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক মাপকাঠি বা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্বারা বিবেচনা করা হলেও এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। সে কারণেই উন্নয়ন এর অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হলো মানবিক ক্ষেত্র বা Human Dimension. এই মানবিক ক্ষেত্রে নানাবিধ বিষয় অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, যেমনঃ জীবন সম্ভাবনা, শিশু মৃত্যু হার, ব্যাধির হার, পুষ্টির মাত্রা, শিক্ষার হার ইত্যাদি। গ্রিফিন ও নাইটসের বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়,

> ...the process of economic development can be seen as a proecss of expanding the capabilities of People.

অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় যা আসলে মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধিরই একটি প্রক্রিয়া সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য মানবিক উন্নয়নও বটে।[৩]

উন্নয়ন গবেষণায় প্রচলিত ধ্যান ধারণার সীমাবদ্ধতাকে নানাভাবে চিহ্নিত করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনাই আকাঙ্খিত সুফল অর্জন করতে পরেনা শুধুমাত্র প্রথাগত অর্থনীতির মডেল ও ধ্যান ধারণা অনুসরণ করার কারণে। কিন্তু উন্নয়ন শুধুমাত্র দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধির চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব বহন করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধির শেষ পর্যায় হিসেবে ধরা হলেও মূলতঃ অর্থনীতিবিদগণ ঐতিহ্যগতভাবে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন এবং এর প্রবৃদ্ধি হারের দিকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। উন্নয়ন আলোচনায় মৌলিক চাহিদা (basic need) প্রত্যয়টির সুবিধাজনক ক্ষেত্র বিরাজ করলেও এখানে মানুষের কথা প্রথমে আসা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।[৪]

উন্নয়নে 'মানুষ' কে বা মানবিক ক্ষেত্রকে প্রথমে গুরুত্ব না দেয়ায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার পরিসর রচিত হয়েছে। উন্নয়নে তথাকথিত অর্থনেতিক সেকটরকে সাংস্কৃতিক উপাদান এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। গৃহস্থালী, উৎপাদন, ধর্মীয় দল, সেচ্ছাসেবী সংস্থা ইত্যাদির মতো সংগঠনগুলিও উন্নয়নের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

যখন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা বলা হয় তখন সমাজ কাঠামোতে এই উন্নয়ন কি ধরনের পরিবর্তন আনবে তাও সনাক্ত করা উচিত। বিশেষতঃ সংস্কৃতির ধরন ও ব্যক্তিক আচরণ এবং প্রভাবকেও বুঝতে হবে। আবার উন্নয়নে সংস্কৃতির কতগুলো বিষয় যেমন, সামাজিক ভূমিকা, নৈতিক সচেতনতা, বৈশ্বিক ধ্যানধারণা স্থানীয় ক্ষমতার বিন্যাস, সম্পদের বন্টন ইত্যাদিও বিশেষ প্রভাব রাখতে পারে। অথচ প্রথাগত উন্নয়ন আলোচনায় সংস্কৃতির এতোসব উপাদানকে প্রাথমিক বিবেচনায় আনা হয় না। এই কারণে শুধুমাত্র কতগুলো অর্থনৈতিক নির্ধারক দ্বারা উন্নয়নকে পরিচালনা করার চিন্তাভাবনা উন্নয়নকে অনেকখানিই সীমাবদ্ধ করে। বর্তমান বিশ্বের গ্রামীণ কমিউনিটি উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে নানা গবেষণা চলছে তাতে সাংস্কৃতিক উপাদনসমূহকে বিবেচনা করার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি সীমাবদ্ধতাকে সনাক্ত করা গেছে যেখানে উন্নয়ন পরিকল্পনায় দাতা ও গ্রহীতাদের ধ্যানধারণার সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন এর ধারণা ও পরিকল্পনায় এক শ্রেণীর নীতি নির্ধারকের প্রাধান্য বজায় থাকছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব মূলতঃ শহরভিত্তিক একশ্রেণীর উন্নয়ন বিশেযজ্ঞ দ্বারা সৃষ্ঠ। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব

করছেন বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক গবেষকগণ, দাতা সংস্থার কর্তাব্যক্তিগণ, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, কনসালটেন্ট, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, আইনজীবি, রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক, স্কুল শিক্ষক, সেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্মী এবং অন্যান্য পেশাজীবিগণ। এই শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণকে কেউ কেউ উন্নয়নে বহিরাগত (Outsiders) হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৫] এসব শহুরে বিশেষজ্ঞগণ মূলতঃ গ্রামীণ দারিদ্রকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন না এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যের স্বরূপকে উপেক্ষা করে নিজেদের ধ্যানধারণায় আবিষ্ট উন্নয়ন ফর্মূলা তারা প্রণয়ন করেন। যেহেতু শহুরে ধ্যানধারণা দ্বারা তারা মোহাবিষ্ট এবং এর সাথেই তাদের নিবিড় যোগাযোগ তাই তারা প্রান্তীয় অঞ্চলের বা গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব শহুরে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদগণ গ্রামীণ অঞ্চলগুলোতে ঝটিকা সফর দিলেও উন্নয়নের সঠিক সমস্যা সমূহকে বুঝতে তারা সক্ষম হন না। এভাবে দেখা যায় গ্রামীণ দারিদ্র্যের মতো মৌলিক সমস্যা শহুরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যত কম অনুধাবন করেন তত কমই গ্রামীণ দরিদ্র ব্যক্তিদের চাহিদার কথা তাদের উন্নয়ন ফর্মূলায় প্রতিফলিত হয়। সুতরাং উন্নয়নে শহুরে উপদেষ্টাদের ধ্যানধারণা এক ধরনের পক্ষপাত (bias) সৃষ্টি করে যা উন্নয়ন সমস্যাকে আরো গভীরতর করে[৬]। এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের ফলে উন্নয়ন কার্যক্রমে দরিদ্র প্রান্তীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ধ্যান ধারণা তেমন প্রতিফলিত হয় না।

উন্নয়ন গবেষণায় উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানীগণ অবদান রাখলেও উন্নয়নে নানা সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানী ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে। নৃবিজ্ঞানী এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদান সমূহের মধ্যকার সম্পর্কসূত্রকে যাচাই ও প্রকাশ করে। অথচ একটি সাধারণীকৃত সূত্র তারা ব্যাপক ভৌগলিক অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য বলে পেশ করে না। বরং তাদের অবস্থানটি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তারা মাইক্রোগবেষণার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প কি করে সফল বা ব্যর্থ হয় তার সূত্রগুলো তুরে ধরতে পারে। কিন্তু একটি জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপকতর প্রেসক্রিপশন তারা কখনোই করতে পারেন না বা করেন না। তারা শুধুমাত্র উন্নয়নের গতিধারাকে প্রভাবিত করে এমন কতগুলো উপাদন ও এদের পরস্পরের আন্তঃসম্পর্ককে তুলে ধরেন।

মূলতঃ উন্নয়ন গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীগণ এই মত পোষণ করেন যে, বিভিন্ন সমাজের নিজস্ব জ্ঞানসমূহকে উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ দেয়া উচিত নয়। যেহেতু উন্নয়ন একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে পরিবর্তন করে দিতে আগ্রহী তাই এসব জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জ্ঞান সমূহকে পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট করতে

হবে। সুতরাং উন্নয়নের প্রকৃতি, লক্ষ্যমাত্রা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদানকে সনাক্ত করতে নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানী যথেষ্ট অবদান রাখতে উন্নয়ন গবেষণায় এভাবে নানা সীমাবদ্ধতা কে কাটিয়ে উঠতে নৃবিজ্ঞান সূচনা করেছে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা approach. আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে উন্নয়নের মানবিক ক্ষেত্রের (Human Dimension) প্রতি মনোযোগী করে তোলে।

উন্নয়ন গবেষণায় প্রত্যয়ন ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতাঃ

প্রত্যয়নেরস্বরূপঃ

উন্নয়ন গবেষণায় নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিত রচনার মাঝেই প্রত্যয়ন বা Perception ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতা নিহিত। তবে আগে প্রত্যয়ন সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া প্রয়োজন। প্রত্যয়ন বা Perception প্রত্যয়টি একটি বিমূর্ত ধারণা।[৭] মূলতঃ মানব আচরণকে প্রভাবিত করে এমন সব প্রচ্ছন্ন উপাদানকে বোঝার ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টিকে নির্দেশ করা হয়। এই আচরণগত উপাদনসমূহ দ্বারা মানব ক্রিয়াকর্মকেও বোঝা সহজসাধ্য। সাধারণভাবে বলা হয় যে, প্রত্যয়ন হচ্ছে বস্তু বা পরিস্থিতি সম্পর্কে এক ধরণের সচেতনতা বা বিবেচনা (appreciation) যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবে প্রত্যয়ন সম্পর্কেও নানা ধ্যান ধারণা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মত দিয়ে থাকেন যে, প্রত্যয়ন হচ্ছে বাস্তবের বিভিন্ন ঘটনার সংকলন (Selection of reality) এবং এগুলো মূলতঃ বাহ্যিক পৃথিবীর বিবিধ বস্তুরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কেউ কেউ আবার ধারণা পোষণ করেন যে প্রত্যয়ন বাস্তবের খন্ডায়িত ঘটনা নয় বরং বস্তু জগতের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা বা অনুমিত সিদ্ধান্তই (Hypothesis) প্রত্যয়ন। অর্থাৎ এই মতানুসারে, প্রত্যয়ন শুধুমাত্র অপ্রত্যক্ষভাবে বাস্তবের সাথে জড়িত। কিন্তু নৃবিজ্ঞানী হিসেবে এই বক্তব্য তুলে ধরা যায় যে, প্রত্যয়ন হচ্ছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা বা বোধ (understanding) যা মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে অথবা অভিজ্ঞতা লাভ করে। সুতরাং প্রত্যয়ন গঠনে সামাজিক উপাদান সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক ঘটনাবলী প্রত্যয়নকে নির্মাণ করতে পারে। আবার বিপরীতভাবে প্রত্যয়নও সামাজিক ঘটনাবলীকে প্রভাবিত বা একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে সক্ষম। অর্থাৎ এই দুটো বিষয় পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন। যে কোন সামাজিক উপাদান বিষয়ক প্রত্যয়ন কোনভাবেই তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট–এর প্রভাবমুক্ত নয়।[৮] সংস্কৃতি তার সদস্যদের বিভিন্ন ধারণা, মূল্যবোধ, মতাদর্শ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। সে কারণেই মানুষের প্রত্যয়ন সমূহ প্রায়শঃই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রথা, ঐতিহ্য, norm,

আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে। সে কারণেই সমাজ গবেষণায় উপরোক্ত সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে সনাক্ত করা প্রয়োজন যা প্রত্যয়ন বা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু একই সাথে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত, প্রত্যয়ন সব সময় বাস্তব এর প্রতিচ্ছবি নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবের অতি নিকটবর্তী তথ্যকে তুলে ধরে। প্রত্যয়ন প্রায়শঃই বিভিন্ন ঘটনা, ঘটনার বর্ণনা ইত্যাদি থেকে প্রতিধ্বনিত বা প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং প্রত্যয়ন আমাদেরকে কোন ঘটনা বা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে বিভিন্ন সূত্র প্রদান করে। সেজন্যই সাধারণভাবে বলা হয়, প্রত্যয়ন হচ্ছে ধারণা, বৈশ্বিক জ্ঞান, সিদ্ধান্ত, মতামত এবং এ ধরনের নানাবিধ জ্ঞান (knowledge)· অর্থাৎ মানুষের প্রত্যয়ন অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন যা বাস্তব চিত্রের একটি ধারণা দিতে পারে।

উন্নয়ন গবেষণায় ''প্রত্যয়ন" এর গুরুত্বঃ

উন্নয়ন গবেষণার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনীতির পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রের উপাদানগুলির গুরুত্ব বিবেচনাকে মূল্য দেয়া হচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রুটি, সমস্যা ইত্যাদি বিষয় যেমন উন্মোচিত হচ্ছে তেমন উন্নয়নে সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাবনা দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যা মোকাবেলায় বিশেষ সহায়ক ও উপযোগী। নৃবিজ্ঞান একেকটি স্বতন্ত্র সমাজকে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা যাচাই করে। সেই সাথে দাবী করে যে, প্রতিটি স্বজাত্য (indigeneous) সম্প্রদায় একেকটি নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং ঐতিহাসিকভাবে নিজস্ব গতিশীলতায় বিবর্তিত হয়েছে এবং এর অন্তর্গত সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বহিঃজগতের প্রভাবে এটি গতিশীল থাকছে। অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান একেকটি সংস্কৃতির নিজস্ব ধ্যানধারণাগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকে যা একটি স্বতন্ত্র নিয়মের অনুসারী। সুতরাং উন্নয়নকেও একেকটি নির্দিষ্ট সমাজের আওতায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও নিয়মের আওতায় বিচার বা মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞান একটি নিজস্ব ধারার সূচনা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং দিনে দিনে এর গ্রহণযোগ্যতা এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সাধারণভাবে বলা যায় প্রথাগত অর্থনীতির মাপকাঠিতে উন্নয়নকে মূল্যায়ন করা হলে অর্থনীতির ধ্যানধারণার আরোপন বাস্তব সমাজক্ষেত্রে সফল হয়নি, ফলে উন্নয়ন গবেষণায় বিভিন্ন ফাঁক বা ত্রুটির সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু উন্নয়নকে প্রথাগত অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন অনেকটা বাইরে থেকে বা উপর স্তর থেকে

আরোপন হিসেবে বিবেচিত হয় তাই উন্নয়ন গ্রহীতাদের মতামত ও চাহিদার সাথে দাতাদের যোগসূত্র খুব কম স্থাপিত হয়েছে। ফলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন অনেকখানিই সম্ভব হয়নি। উন্নয়নকে তৃণমূল স্তর (grassroot level) থেকে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হলে সাফল্য অর্জন অনেকখানিই সম্ভব হতো বলে অনেকে মনে করেন। এই ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞান তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে একেকটি সমাজের স্বজাতিক জ্ঞান (indigeneous knowledge) কে কাজে লাগানো বা বিবেচনা করা। এই স্বজাতিক জ্ঞান আর কিছুই নয়, একেকটি সংস্কৃতির জনগণের নিজস্ব ধ্যান ধারণা বা প্রত্যয়ন। যদি গ্রামকে একটি দেশের উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে চিন্তা করা হয় তবে গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারে এর সদস্যদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা ধ্যানধারণা বা প্রত্যয়ন সমূহ। শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়ন নয়। তাই গ্রাম ও শহরের নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। আর তাই প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রের উন্নয়নে অংশ গ্রহণকারীদের মতামত বা প্রত্যয়নের সমন্বয় ঘটানো।। এভাবে উন্নয়ন গবেষণায় 'প্রত্যয়ন' এর প্রাসঙ্গিকতা রচিত হয়েছে।

প্রত্যয়ন ব্যাপকভাবে সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী একেকটি প্রপঞ্চকে ভিন্নভাবে প্রত্যয়িত করে থাকে। উন্নয়ন গবেষণায় এই ভিন্নতার সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহকে সংস্কৃতি ভেদে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। উন্নয়নে দাতা ও গ্রহীতার প্রত্যয়ন একই সূত্রে চলতে পারে না। তাই নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যয়নকে বিবেচনা করে যা উন্নয়নে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের শূণ্যতাকে অনেকখানিই ভরাট করতে পারে। অথচ এই ভারসাম্য রক্ষার সমস্যায় অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা আকাঙ্খিত ফল লাভ করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির উপাদানগুলো উন্নয়নের গতিকে বারবার ব্যহত করেছে। এই ব্যর্থতার সূত্রগুলোকেই তুলে ধরতে পারে একেকটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যয়ন সমূহ। একেকটি জনগোষ্ঠীকে প্রবর্তিত যে কোন বিজ্ঞান সম্মত নূতন প্রকল্প প্রাথমিকভাবে যতই আধুনিক গুরুত্ব বহন করুক না কেন এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার কতগুলো সামাজিক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হতে পারে। ফলে যখন কোন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প চালু করা হয়, এর পরবর্তী পরিবর্তন বা সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলোর কথাও চিন্তা করতে হবে। তা না হলে জাভায় পঞ্চাশ দশকে প্রবর্তিত সবুজ বিপ্লবের মতো আরো ব্যর্থতার ইতিহাস আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।[১০] এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের উদাহরণও দেয়া যায়। সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রত্যয়নকে বুঝতে হবে যা সামাজিক প্রতিক্রিয়াকেও তুলে ধরবে।

সামাজিক–সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ও প্রত্যয়ন ঃ

উন্নয়নের ক্ষেত্রে সামাজিক–সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে কিছুটা ব্যাখ্যা করা হলে প্রত্যয়নের গুরুত্বকে আরো বিষদভাবে বোঝা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ফস্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছে।[১১] মূলতঃ এই রচনায় তার বক্তব্যের অনেকাংশই অনুসরণ করা হবে।

সমাজ বিজ্ঞানীগণ তাদের জ্ঞানগত অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নয়নকে এক ধরনের পরিবর্তন হিসেবে দেখে থাকেন যা সমাজ কাঠামোতে, সংস্কৃতিতে ও ব্যক্তিক আচরণে ঘটে থাকে। এই তিনটি পর্যায়ে কি করে পরিবর্তনগুলো পরস্পরকে প্রভাবিত করে তা বোঝার জন্য ফস্টার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মানুষ ও তাদের দলগত কর্মকান্ডকে তিনটি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমতঃ মানুষের ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয় কতগুলো সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যেখানে ব্যক্তি ও তার দল কতগুলো অধিকার ও দায়িত্ব দ্বারা সম্পর্কিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ এক্ষেত্রে একটি দলগত আচরণ ব্যবস্থা কাজ করে যা মানুষকে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেবার ক্ষেত্রে কতগুলো আচরণবিধি শেখায় এবং তা অনুসরণ করার শিক্ষা দেয়। তৃতীয়তঃ একটি ক্রিয়াশীল ব্যক্তিক জ্ঞান ও আচরণ ব্যবস্থার মাঝে কাজ করে যা মানুষ একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে তা শেখায়। এই তিনটি ব্যবস্থা যা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বলে বিবেচিত তাকে ফস্টার সমাজ, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্ব বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি প্রায়শঃই পরস্পর প্রবিষ্ট। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ধারণাটির সাথে সংশ্লিষ্ট করেই সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। সমাজ প্রত্যয়টি একটি নির্দিষ্ট, স্বীকৃত, বর্ণনাধর্মী, জনগোষ্ঠীর ধারণা দেয়। আর সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট সমাজের জনগণের জীবনযাত্রার ধরনকে। উন্নয়ন মূলতঃ পরিকল্পিত সামাজিক–সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে বোঝায় যাতে মনস্তাত্ত্বিক একটি ক্ষেত্রও ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে পরিবর্তনকে গ্রহণ করার মতো সামাজিক–সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আচরণ বিধিকে সনাক্ত করা প্রয়োজন যা উন্নয়নের গতিকে অগ্রসর রাখতে পারে। সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর প্রবিষ্ট বলে একে সামাজিক–সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা বা Socio-Cultural System বলা অযৌক্তিক হবে না। আবার যেহেতু এই ব্যবস্থা একটি যৌক্তিকভাবে ক্রিয়াশীল, বোধসম্পন্ন একক তাই এর মাঝে যে সব প্রথা, অভ্যাস, ভূমিকা, মর্যাদা ইত্যাদির ধারণা কাজ করে তাও উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজের একটি সংগঠন বা সাংস্কৃতিক স্তরে একটি পরিবর্তন ঘটলে তা অন্যান্য অংশের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে আরো পরিবর্তনের ধারা সূচিত করবে। পশ্চিম মাদাগাস্কারের তানালা (Tanala)

সমাজের এ ধরনের একটি উদাহরণ দেয়া যায়। এই পাহাড়ী সমাজটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত স্ল্যাশ এন্ড বার্ন (Slash and burn) পদ্ধতিতে গোষ্ঠী ভিত্তিক ধান চাষ করতো বলে নূতন উর্বরা জমির খোঁজে প্রায়শঃই স্থানান্তরিত হতো। এর জন্য জমির ব্যক্তিক মালিকানা গড়ে উঠতে পারেনি ও সম্পদের অসম বন্টন ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীতে জলাভূমিতে ধান চাষের জন্য কিছু পরিবার পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে অবস্থান নেয়। এর জন্য একেকটি একক পরিবারের শ্রমই যথেষ্ট ছিল এবং এতে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে যায়। কয়েক বছরের মাঝে এই চাষপ্রথা লাভজনক হয় ও জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। এতে আস্তে আস্তে সে অঞ্চলে পূর্বের সামাজিক শ্রেণীগুলো ভেঙ্গে জমিমালিক ও ভূমিহীন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এভাবে গ্রামের পূর্বের লিনিয়েজ প্রথা ও গ্রামীণ একক সমূহ ভেঙ্গে যায় এবং স্বাধীন গ্রামীণ দলগত প্রথা একটি ট্রাইবাল সমাজে রূপ নেয়।[১২] সুতরাং সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল এককগুলোকে বুঝতে হবে যা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে।

আবার প্রতিটি সংস্কৃতিতে একেক ধরনের মূল্যবোধ ব্যবস্থা কাজ করে যা সেই নির্দিষ্ট সমাজে প্রবর্তিত পরিবর্তন গ্রহণীয় অথবা প্রত্যাখ্যাত হবার সূত্রগুলোকে তুলে ধরে। শুধু তাই নয় সংস্কৃতিতে থাকে নিজস্ব কিছু জ্ঞানগত ধারা যা তাদের ভালোমন্দ বোঝার বোধকে সৃষ্টি করে। ফলে এসব উপাদানকেও সনাক্ত করা উচিত যা উন্নয়ন বা পরিবর্তনে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

তাছাড়া সমাজ কোন বদ্ধ একক নয় বরং এটি প্রতিনিয়তঃ পরিবর্তনশীল এবং একেকটি উপাদান পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত। সুতরাং সমাজের পরিবর্তনশীল উপাদানগুলো কোন্ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অন্য একটি পরিবর্তনের সাথে একাত্ম হবে বা প্রতিক্রিয়াশীল হবে তা বুঝতে হবে একেকটি সমাজ-সংস্কৃতির নিজস্ব প্রেক্ষাপটে।

সমাজ ও সংস্কৃতির উপরোক্ত উপাদানগুলো আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই দুটি প্রত্যয়ের যে প্রেক্ষাপট রয়েছে তাকে বোঝা। কারণ এই বিষয়টি মূলতঃ উন্নয়ন প্রত্যয়ন এর সাথে পরস্পর প্রবিষ্ট একটি প্রাসঙ্গিক সূত্র। এবার কতগুলো উদাহরণ দ্বারা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন এর গুরুত্বকে ব্যাখ্যা করা যাক। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান মানুষের নিত্যদিনের অভ্যাস থেকে শুরু করে গ্রহণযোগ্য সামাজিক চর্চায় আবর্তিত হতে পারে যা বিভিন্ন বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ কাঠামো ইত্যাদি রূপে অবস্থান করতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতে কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে দুবের উদ্বৃতি থেকে কতগুলো উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। ভারতে উত্তর প্রদেশের কিছু গ্রামে উচ্চফলনশীল উন্নত

জাতের গম প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের আচরণ ও স্বাদ গ্রহণের প্রথাগত চর্চার কারণে। এতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের স্থানীয় জাতের গমের তুলনায় উচ্চফলনশীল উন্নত জাতের গমের স্বাদকে গ্রহণ করতে পারেনি বলে নূতন প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে নূতন জাতের গমের রুটি বানাতে নারীদের অসুবিধা ও এর নূতন স্বাদ গ্রহণীয় না হবার কারণে স্থানীয় জাতের গমই প্রবর্তিত উন্নত জাতের গম থেকে বেশী সমাদৃত হয়েছিল।[১৩] এভাবে ব্যর্থতার সূত্রগুলো জানা যায় একেকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা প্রত্যয়ন থেকে।

আবার একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক চর্চা অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পকে ব্যাহত করতে পারে। যেমন ভারতে উত্তর প্রদেশে গৃহীত শিক্ষা কার্যক্রম। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হলেও বয়স্ক লোকজন অল্প বয়সীদের মতো স্কুলে যেয়ে লেখাপড়া শিখতে আপত্তি জানায়, অথচ শিক্ষার গুরুত্ব সবার কাছেই স্বীকৃত ছিল। এই ধরনের সমস্যার সমাধানের সূত্রও দিতে পারে সেই জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধ্যানধারণাবাপ্রত্যয়ন।[১৪]

অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নে মানুষের বিশ্বাসের সংবেদনশীল এলাকা থেকেও বাধা আসতে পারে। আর এই বিশ্বাসগুলো ঐতিহ্যবাহী চর্চার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে টিকে থাকছে। দুবে আরেকটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, উত্তর ভারতের গ্রামে small pox পবিত্রতার ধারণার সাথে যুক্ত যা দেবীর আগমন হিসেবে বিবেচিত। সে কারণে এসব স্থানের জনগণ ডাক্তারী ওষুধপত্রের সাহায্য নেবার চেয়ে বিভিন্ন পূজা অর্চনা ও আচার অনুষ্ঠান পালনে অনেক বেশী আগ্রহী। এছাড়াও ফস্টারের গবেষণায় দেখা গেছে জাম্বিয়ায় পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম স্থানীয় জনগণের প্রথাগত বিশ্বাসের কারণে ব্যহত হয়েছে, যেখানে নারীদের ডিম (egg) খাওয়া নিষিদ্ধ বলে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে জনশ্রুত বিশ্বাস এই যে, ডিম নারীর প্রজননে বাধার সৃষ্টি করে, শিশুদের চুলের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ করে এবং নারীদের চরিত্রহীন (licentious) করে।[১৫] কিন্তু উন্নয়নে এসব সামাজিক–সাংস্কৃতিক বাধাকে উপেক্ষা করে নূতন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এসবের জন্য উন্নয়নে দাতা ও গ্রহীতার প্রত্যয়নের সমন্বয়ের প্রয়োজন। ফস্টার ঘানার ক্ষেত্রে এ ধরনের সফল উদাহরণ দেখিয়েছেন। যেখানে কয়েকটি অঞ্চলে শিশুদেরকে মাছ বা মাংশ খেতে দেয়া হতো না। কারণ এ অঞ্চলের জনগণের বিশ্বাস ছিল, এতে শিশুদের ক্ষুদ্রান্ত্রে কৃমির আক্রমণ ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনাকারীগণ শিশু স্বাস্থ্যে প্রোটিনের ঘাটতি দূর করার জন্য উন্নত প্রোটিন সমৃদ্ধ সীম জাতীয় তরকারী ও ডাল প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস উন্নয়ন প্রকল্পে যে বাধার সৃষ্টি করেছিল তার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল।[১৬]

উপসংহারঃ

এই আলোচনায় উন্নয়ন গবেষনায় 'প্রত্যয়ন' বা Perception এর গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানের যে দৃষ্টিভঙ্গটির সূচনা হয়েছে তাতে স্বজাতিক জ্ঞানকে (indigeneous knowledge) প্রাধান্য দেয়া হয়।[১৭] এই স্বজাতিক জ্ঞান আর কিছুই নয়– একেকটি সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধ্যানধারণা বা প্রত্যয়ন সমূহ। প্রত্যয়ন একেক সংস্কৃতিতে একেকভাবে রূপ লাভ করে। এসব সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা বা প্রত্যয়ন সমূহকে সনাক্ত করা একান্ত প্রয়োজন যা একেকটি সমাজে উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। শুধুমাত্র প্রথাগত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়নকে বিবেচনা করা হলে এর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের অনেক অংশই অবহেলিত থেকে যায়। সে কারণে উন্নয়ন গবেষণায় নৃবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি যা একেকটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের প্রতি সহানুভূতিশীল। এর ফলে উন্নয়নের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মনস্তাত্বিক ইত্যাদি ব্যাপক ক্ষেত্রগুলোও গবেষণায় আলোচিত হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রথাগত অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করে। তাছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টাদের সৃষ্ট পক্ষপাতকে দূর করার ক্ষেত্রে সামাজিক–সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রত্যয়নকে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই বিবিধ সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে উন্নয়নের নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতাকে তথা প্রত্যয়ন গবেষণাকে বহুলভাবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। শুধুমাত্র এর ফলেই উন্নয়নের কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন সম্ভব এবং ব্যর্থতাকে সনাক্ত করা ও অতিক্রম করা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশঃ

১. উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণায় স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক নৃবিজ্ঞান বিভাগে একদল গবেষক "Development as ideology and Folk Model" সংগঠনটি গড়ে তোলেন। তাদের ২২·১১·১৯৮৯ তারিখে প্রকাশিত প্রথম ইশতেহার পত্র থেকে এ প্রবন্ধে উন্নয়নের বিকাশ সম্পর্কিত কিছু ধারণার উদৃতি দেয়া হয়েছে।

২. দেখুন, Meier, Gerald M., 1976. *Leading issues in Economic Development,* Oxford University Press, New York, (p p 29-30)

৩. Haque, Khadija and Kirdar, Uner 1986, *Human Development, The Neglected Dimension,* North South Roundtable, Islamabad, Pakistan.

৪. Chambers Robert, Rural Poverty unperceived, in Chambers, R., *Rural Development : Putting the last First,* Longman, London pp. 1-26, 1983.

৫. পূর্বোক্ত।

৬. পূর্বোক্ত।

৭. *Encyclopedia of the Social Science,* Macmillan New York, 1968 থেকে প্রত্যয়ন এর কিছু ধারণা নেয়া হয়েছে।

৮. এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, Israt Ahmed, *Perception of people about development : A case Study of two villages of Bangladsh.* অপ্রকাশিত এম·এস·এস· থিসিস, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

৯. পূর্বোক্ত।

১০. পূর্বোক্ত।

১১. Foster, George, M., *Traditional Societies and technological change,* Allied Publishers, India, 1973.

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. Dube, S.C., 8 Cultural Factors in Rural Community Development, in, Mathur, H.M., 1977, *Anthropology in the Development Process,* Vikas Publishing House, New Delhi.

১৪. পূর্বোক্ত।

১৫. Foster, 1973, পূর্বোল্লিখিত।

১৬. পূর্বোক্ত।

১৭. Choudhury, Ahmed Fazle Hasan, 1986, *Indigeneous Knowledge System : A Development Paradigm in Anthropology,* in Bangladesh Sociological review, Vol. 2, No. 1, September.